মহাভারতে যৌনতা

শামিম আহমেদ

মহাভারতে যৌনতা
শামিম আহমেদ

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ৪০০ টাকা

MOHABHARATE JAUNATA by Samim Ahmed Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2020
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 400 Taka RS: 400 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94238-5-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

রূপা আহমেদকে

সূচিপত্র

বাংলাদেশি সংস্করণের জন্য ৯
ভূমিকা ১০
যৌনতা ও স্বৈরাচার ১৭
বহুপত্নী ও বহুপতি ৩২
আঠারো রকমের যৌনমিলন ৫২
ইতরকাম ৭৮
শবদেহের সঙ্গে যৌনাচার ৮৩
অজাচার ৯০
সঙ্গমে কার বেশি আনন্দ, স্ত্রী না পুরুষের? ১০০
গণিকাবৃত্তি ১০৬
লিঙ্গপুরাণ ও মহাভারত ১১৫
কামদেব ও রতিদেবী ১২২
কামসূত্র ও মহাভারত ১৩২
তন্ত্র, কামাচার ও মহাভারত ১৪১
মহাভারতে ধর্ষণ ১৫০
বিপরীত লিঙ্গের বস্ত্রকাম ১৬৩
মিলনে অনু ও প্রতি ১৭২
কামগীতা ১৮২
মিলনে উপেক্ষিতা নারী ১৮৭
নারী-সমকামী, পুরুষ-সমকামী, উভকামী ও রূপান্তরকামী ২০১
গ্রন্থপঞ্জি ২০৫

বাংলাদেশি সংস্করণের জন্য

‘মহাভারতে যৌনতা’ নামক বইটির চাহিদা বাংলাদেশে রয়েছে, এ কথা অনেকের মুখে শুনেছি। কবি প্রকাশনীর কর্নধার অনুজপ্রতিম বন্ধু সজল আহমেদ বইটি প্রকাশের কথা বলেন। আমি তাতে সম্মত হই এবং তাঁকে বইটি বাংলাদেশে প্রকাশ করতে বলি। কবি প্রকাশনীকে ‘মহাভারতে যৌনতা’ গ্রন্থটি বাংলাদেশে প্রকাশ করতে সানন্দে অনুমতি দিই। আশাকরি, এ বাংলার মতো বাংলাদেশে বইটি সমান জনপ্রিয় হবে।

শামিম আহমেদ
০২.০৯.২০১৯
পশ্চিমবঙ্গ

ভূমিকা

মহাভারত হলো ভারতের দ্বিতীয় মহাকাব্য। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থ মহাভারতে বিধৃত হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের প্রাচীন 'ইতিহাস'। 'মহাভারতে যৌনতা' গ্রন্থটি তৃতীয় পুরুষার্থ 'কাম'-কে কেন্দ্র করে রচিত। সুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ, পঞ্চানন তর্করত্ন, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, রাজশেখর বসুর মহাভারত-সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া এই গ্রন্থ রচিত হতো না।

'যৌনতা' ও 'কাম' শব্দ দুটির অর্থ এক নয়। 'যৌন' হলো যোনিসম্বন্ধী, কন্যাদানাদি, বৈবাহিক। 'কাম' হলো ইচ্ছা। অর্থাৎ 'যৌনতা' কামের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু শব্দটিকে কয়েকটি শর্ত পালন করতে হয়। প্রথম অধ্যায়ে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা আছে। গ্রন্থটি লেখার জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে প্রধান হলো, বাগর্থতত্ত্ব, ইংরেজিতে যাকে Semantics বলে। তবে এই বাগর্থতত্ত্ব বা শব্দ ও অর্থের সম্পর্কতত্ত্ব আধুনিক বা পাশ্চাত্য নয়। আচার্য যাস্কের নিরুক্ত হলো এই বাগর্থতত্ত্বের আশ্রয়। আচার্য মনে করতেন, বেদ ও প্রাচীন সাহিত্যের অর্থ নির্ধারণ করতে হলে এক ধরনের কৌশল নিতে হয়। শব্দের মূলীভূত ধাতু হলো শব্দের মূল শক্তি। 'ধাতু' হলো ধারক, ভূ গম ইত্যাদি নামপ্রকৃতি। যাস্ক শব্দের অর্থ নিষ্কাশনের পদ্ধতি হিসেবে ধাতুকেই গ্রহণ করেছেন। প্রতিশব্দের সংকলন হিসেবে 'নিরুক্ত'-তে 'নৈঘণ্টুক' সংযোজিত হয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থসমূহের যে সব অদ্ভুত শব্দ আছে, তার তালিকাকে বলে 'নৈগম'। দেবতা ও যজ্ঞ বিষয়ক শব্দসমূহের সংকলন বা 'দৈবত' নিরুক্তের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন ভাষাতত্ত্বে আচার্য যাস্ক প্রধান একটি নাম। সম্ভবত তিনি পাণিনিরও পূর্ববর্তী। পাণিনি ব্যাকরণ (Syntax) নিয়ে কাজ করে গিয়েছেন, তেমনই নিরুক্ত (Semantics)-র আদি গুরু হলেন যাস্ক। যাস্কের বক্তব্য, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ আরোপিত বা বৃদ্ধব্যবহারজনিত নয়; তা স্বাভাবিক অর্থাৎ শব্দের ভেতরেই অর্থ লুকিয়ে থাকে, তাকে খোঁজার জন্য শব্দ বা ভাষার বাইরে বেরোতে হয় না।

নিরক্তকে ষড় বেদাঙ্গের অন্যতম বলা হয়। যাস্ক চার প্রকার শব্দকে ব্যাখ্যা করেছেন। নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত। দ্বিতীয়ত হলো ক্রিয়া এবং চতুর্থটি সম্ভবত অব্যয়। প্রতিটি শব্দের পেছনেই ক্রিয়া/ধাতু বিদ্যমান। ভাব ও সত্ত্ব হলো শব্দের দুটি প্রকৃতি। ভাব হলো ক্রিয়া আর সত্ত্ব হলো বস্তু। ক্রিয়াকে 'ব্রজতি' বা

'পচতি' (Cook) বলা হয়। অবশ্য যাস্কের এই মতবাদকে ঘিরে প্রাচ্যে বিতর্ক ওঠে। যাকে 'নৈরুক্ত বনাম বৈয়াকরণের তর্ক' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। শব্দ ও অর্থের তাদাত্ম্য-সম্বন্ধের ধারণার বিরোধিতা করেন নৈয়ায়িক, সাংখ্য, বৌদ্ধ। তাঁরা পাশ্চাত্যের মতো শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে বাচ্য-বাচক (Signifier-Signified) সম্বন্ধরূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। বৈয়াকরণ পাণিনি এঁদের গুরু। তবে পাশ্চাত্যেও শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে দেহ-আত্মার সঙ্গে তুলনা করে হয়েছে। সেটা প্লেটোর সময়। কিন্তু পরবর্তী কালে দুই স্যোসুর, স্যাপির, ব্লুমফিল্ড, হিয়েল্মশ্লেভ, ম্যালিনোভস্কি শব্দ-অর্থ সম্পর্ককে বোতলের লেবেল আর ভেতরে পানীয়ের সঙ্গেই তুলনা করলেন। চমস্কিও বললেন, শব্দের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক অর্থের ভিত্তি। শব্দের একটি গভীর কাঠামো আছে এবং বহিরঙ্গ গঠনও আছে। অর্থ নিয়ন্ত্রণ করে বহিরঙ্গ গঠন ও অর্থ নির্ধারিত হয় সম্পর্কতন্ত্রের মাধ্যমে। 'ডিপ স্ট্রাকচার ডিবেট' অনেকটা নৈরুক্ত বনাম বৈয়াকরণের বিতর্কের মতো। প্রবীণ-চমস্কি তাঁর জিবি থিয়োরিতে জানালেন, বাক্যের শব্দার্থতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নির্ভর করে বহিরঙ্গ গঠনের ওপর। শব্দের গভীর কাঠামোর যে পরিবর্তন তার প্রতিনিধি হিসেবে বাইরের কাঠামোই যথেষ্ট, কারণ সেই-ই ভেতরের চিহ্ন বহন করে চলে।

অবশ্য বাক্যের পরিবেশগত ব্যবহারিক ব্যঞ্জনাকে নোম চমস্কি শব্দার্থতত্ত্বের বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রয়োগতত্ত্বের অঞ্চলে ফেলেছেন। যার ফলে ভাষায় দু'রকম অর্থ তৈরি হয়— ব্যাকরণগত ও প্রায়োগিক। ভাষাবিজ্ঞানী জন লায়নস এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আচার্য যাস্ক যে এগুলিকে এড়িয়ে গিয়েছেন, তা নয়। প্রয়োগার্থ বিষয়ে যাস্ক থেকে আনন্দবর্ধন প্রত্যেকেই সূক্ষ্ম বিচার করেছেন। সে আলোচনা এই ভূমিকায় অপ্রাসঙ্গিক।

মোদ্দা কথা হলো, এই সন্দর্ভ রচনার যে পদ্ধতি (নিরুক্ত) তা হলো নিঃশেষে ব্যাখ্যাত বা কথিত। মহাভারতে আচার্য যাস্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। নারায়ণীয় প্রকরণে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন "উদারধী ঋষি যাস্ক 'শিপিবিশিষ্ট' নামে আমার স্তুতি করেছেন, আমার প্রসাদেই নিরুক্তশাস্ত্র তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়। পাতাল থেকে তিনি নিরুক্তকে উদ্ধার করেন" (শান্তিপর্ব, ৩৪২/৭৩)। নির্ঘন্টু প্রক্রিয়া দ্বারা শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থগ্রহণের কথা বলা হয়েছে :

নির্ঘন্টুকপদাখ্যানে বিদ্ধি মাং বৃষমুত্তমম্ (শান্তিপর্ব, ৩৪২/৮৮)

সুতরাং মহাভারতের অর্থ নিষ্কাশনে যে পদ্ধতি গ্রহণের কথা বলা হলো, তার একটা বৈধতা আছে। 'যৌনতা ও স্বৈরাচার' নামক প্রথম অধ্যায়েও যাস্কের নিয়ম অনুসৃত হয়েছে।

মহাভারতে বহুপতিবাদ বা বহুপত্নীবাদ বিরল নয়। পুরুষের একাধিক স্ত্রীগ্রহণ অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে গণ্য হতো। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু একাধিক নারীর সঙ্গে সহবাস করেছেন। পঞ্চপাণ্ডবও তার ব্যতিক্রম নন। এমনকি স্বয়ং ব্যাসদেব, রাজা শান্তনু, বিচিত্রবীর্য কেউই এক নারীতে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। মধ্যম পাণ্ডব ভীমের বা তৃতীয়

পার্থ অর্জুনের চারটি করে স্ত্রী ছিলেন। আবার দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামী, মাধবীর চার পতিগ্রহণ, কুন্তীর পাঁচ পুরুষে উপগত হওয়ার কথা মহাভারতে পাওয়া যায়। জটিলা সাতজন ঋষিকে একসঙ্গে বিবাহ করেন। বাক্ষী দশজন ভ্রাতাকে একই সময়ে পতি হিসেবে বরণ করেন। কুরু প্রভৃতি দেশে নারীদের মধ্যে বহু পুরুষকে স্বামীত্বে বরণ করার চল ছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ের এটিই উপজীব্য।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ১৮ রকমের যৌনমিলন। মানুষ পিতামাতার যৌনমিলন থেকে পাখি ও সাপের জন্ম, ইতরপ্রাণীর মানবসন্তানের আকাঙ্ক্ষায় যৌনসঙ্গম, সাপ ও মানুষের সহবাস, মাছের সঙ্গে মানুষের সংযোগ ও সন্তান-উৎপাদন, জড় পদার্থের সঙ্গে মানবের মিলন, অপ্সরা (স্বর্গবেশ্যা নামক দেবতা) ও মানুষের মিলনে সন্তান, অপ্সরার সঙ্গে গন্ধর্ব ও যক্ষের মিলন, রাক্ষসী ও মানুষের যৌনমিলন, শুধু শুক্রের আলোড়নে ও অরণি মন্থনে পুত্র-উৎপাদন, অযোনিজ সন্তান, মৃতের সঙ্গে সহবাসের ফলে সন্ততিলাভ, আগুন ও মন্ত্রের যৌনমিলন থেকে মানুষের উৎপত্তি, আম-সংযোগে নারীর সন্তান ধারণ, মন্ত্রপূত জলের সঙ্গে মিলনে পুরুষের সন্তানলাভ, পুরুষের স্ত্রীরূপ ধারণ করে সন্তান-উৎপাদন, এক পুত্রকে আহুতি দিয়ে শতপুত্র লাভ, পুরুষের মুষলপ্রসব এই পর্বে আলোচ্য। এর মধ্যে কিছু 'অলৌকিক' মিলন আছে, যদিও মহাভারত লৌকিক ও স্বাভাবিক মিলনের পক্ষপাতী। চতুর্থ অধ্যায়টি 'ইতরকাম' নিয়ে। ইতরযৌনতা, জন্তুপীড়ন, ইতরাসক্তি, জন্তুধর্ষকাম বলেও একে অভিহিত করা যায়। মহাভারতের নানা জায়গায় যেসব চিত্র পাওয়া গিয়েছে, তা তুলে ধরা হয়েছে। মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী, ইতরকাম এক ধরনের বিকৃতি, যদিও পিটার সিঙ্গারের মতো নৈতিক দার্শনিক ইতরকামকে শর্তসাপেক্ষে গ্রহণীয় বলেছেন।

পঞ্চম পর্বটিও একধরনের যৌনবিকৃতি নিয়ে। 'শবদেহের সঙ্গে যৌনাচার' তার শিরোনাম। শবপ্রীতিকে মনোবিদ্যা যৌনবিকারের পর্যায়ে ফেলে। প্রাচীন মিসর, তুরস্ক এবং অন্যান্য নানা দেশের কাহিনিতে শবপ্রীতির কথা পাওয়া যায়। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদের মধ্যেও এই আচরণ লক্ষ করা যায়। হাঁস জাতীয় এক ধরনের পাখি, আফ্রিকার জঙ্গলে একটি প্রজাতির পোকার মধ্যে শবপ্রীতি লক্ষণীয়। ওই পোকারা মৃত পোকাদের সঙ্গে মিলিত হয়েই বংশবিস্তার করে। কৌলতন্ত্রের যে বামাচার তা শবপ্রীতিকে সাধনার অন্তর্ভুক্ত করে। মহাভারতে মৃত রাজা ব্যুষিতাশ্বের সঙ্গে তাঁর রানি ভদ্রা মিলিত হন ও সাতজন পুত্রের জন্ম দেন। এমনকি অশ্বমেধ যজ্ঞের যে যৌনাচার তা একই সঙ্গে শবমিলন এবং ইতরকাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'অজাচার', ইংরেজিতে যাকে incestuous relation বলে। মহাভারতে এই সম্পর্ক নিন্দনীয়। ঋগ্বেদে পূষণ ও তাঁর ভগ্নীর অজাচারের জন্য মহাদেব পূষণকে লাথি মারেন এবং পূষণের ভগ্নী ভগের চক্ষু উৎপাটন করেন। অগ্নিদেবতারও এমন সম্পর্কের কথা পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতিকে 'অজাচারী' বলা হয়েছে। মহাভারতে গুরুপত্নী মাতার সমান।

কিন্তু চন্দ্র যখন দেবতাদের গুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে অপহরণ করে তাঁর গর্ভে পুত্র-উৎপাদন করেন তখন তাকে কি অজাচার বলা যাবে! রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'গুরুকন্যা বিবাহ কি নিষিদ্ধ নয়?' কারণ গুরুকন্যা হলেন ভগ্নী। যদিও গুরুকন্যার সঙ্গে প্রণয়, বিবাহ মহাভারতে লক্ষ করা যায়। যম-যমীর উপাখ্যান সর্বজনবিদিত। অর্জুন তাঁর ঔরসজাত পিতা ইন্দ্রের সঙ্গিনী অর্থাৎ তাঁর 'বিমাতা'-কে প্রত্যাখ্যান করলে, কামার্তা উর্বশী তৃতী পাণ্ডবকে 'হিজড়ে' হওয়ার অভিশাপ দেন। প্রাচীন মিসর, গ্রিক পুরাণে অজাচারের নানা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তুতানখামেন তাঁর বৈমাত্রেয় বোনকে বিবাহ করেন। অয়দিপাউসের কথা বহু আলোচিত। অ্যাডামের পুত্র-কন্যারা মিলিত হয়ে পরবর্তী প্রজন্মের জন্ম দেন। তেমনই ব্রহ্মার বিরুদ্ধেও অজাচারের অভিযোগ এবং মহাদেবের শাস্তির কথা বিভিন্ন পুরাণে মেলে। কোসাম্বি লিখেছেন,

'Later mythology takes creation as resulting from the incest of Prajapati with his own daughter, the root stanzas being found in the Rgveda.' (Kosambi, Myth & Reality, Popular Publication (2005), pg. 64)

সঙ্গমে কার বেশি আনন্দ? স্ত্রী না পুরুষের? এ বিষয়ে তিনটি মত আছে। সপ্তদশ শতকে একদল চিকিৎসক এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে মত দেন, নারীর কাম-লিপ্সা ও সঙ্গমানন্দ অনেক বেশি। গ্রিক পুরাণে জিউস ও হিরা এ নিয়ে তর্ক করলে ঋষি টাইরিসিয়াস বলেন, সঙ্গমকালে নারী বেশি আনন্দ পান। মহাভারতে রাজা ভঙ্গাস্বন টাইরিসিয়াসের মতো পুরুষও নারী হয়ে সঙ্গম করেছেন। তাই তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলছেন, নারী সহবাসকালে অধিক সুখ পান। এমনকি পুরুষের তুলনায় তাঁরা সন্তানের প্রতি বেশি স্নেহপ্রবণ। সপ্তম অধ্যায়ের এটিই আলোচনার বিন্দু।

গণিকাবৃত্তি বহু পুরনো এক প্রথা। মহাভারতের মতো মহাকাব্যে গণিকাদের সন্ধান পাওয়া যায়। মহাকাব্যে 'গণিকা'-কে 'বন্ধকী' বলা হয়, যার অর্থ বেশ্যা। কুন্তীর কথায়, নারী যদি পঞ্চম পুরুষ সংসর্গ করে তাহলে তাকে 'বন্ধকী' বলা হয়। মহাভারতের শারদণ্ডায়ণী, পিঙ্গলার উপাখ্যান রয়েছে। অর্থশাস্ত্রে দেখা যায়, গণিকাবৃত্তি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় গণিকালয় তৈরি হয়েছে সেখানে। শহরের দক্ষিণে গণিকারা বাস করতেন। গণিকাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত শুল্ক রাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডারের আয়ের একটা বড় উৎস ছিল। অষ্টম অধ্যায়ে এ নিয়ে কিছু কথা আছে।

আঠারোটি পুরাণের মধ্যে লিঙ্গপুরাণ অন্যতম। এই পুরাণে সর্বমোট ৪৪টি লিঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের মধ্যে শৈলজ লিঙ্গ সবশ্রেষ্ঠ। 'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করে একটা দার্শনিক জায়গায় পৌঁছনোর চেষ্টা করা হয়েছে নবম অধ্যায়ে। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে লিঙ্গের কথা আছে। শান্তিপর্বেও এর কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়।

দশম অধ্যায়টি কামদেব ও রতিকে নিয়ে। কামদেব হলেন প্রেমের দেবতা। রতি তাঁর স্ত্রী। তাঁদের উপাখ্যান, মহাভারতে মদন-রতির উপস্থিতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।

বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' মহাভারতের তুলনায় নবীন। কামসূত্র এসেছে 'কামশাস্ত্র' থেকে, যা মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন। মহাভারতে কাম-আলোচনার সঙ্গে কামসূত্রের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচিত হয়েছে একাদশ পর্বে।

তন্ত্র, কামাচার ও মহাভারত নিয়ে কিছু কথা বলা হয়েছে দ্বাদশ অধ্যায়ে। শিব ও শক্তির উপাসনা করা হয় তন্ত্রে। মোট তন্ত্রের সংখ্যা ১৯২, তার মধ্যে ৬৪টি বাংলার। গোরক্ষনাথ তান্ত্রিক নকুলকে স্তম্ভন শিখিয়েছিলেন। যার মাধ্যমে নিদ্রা ও যৌনতাকে জয় করা যায়। অর্জুন গরেডি মন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। সুভদ্রাও তন্ত্রমন্ত্র জানতেন। 'তন্ত্র'-কে অনেকে 'পবিত্র যৌনতা' বলে থাকেন। তন্ত্রের আসল শিক্ষা হলো কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করা। যার নাম তন্ত্রমর্দন। বৌদ্ধ তন্ত্রের কথাও সুবিদিত। তবে তন্ত্র কতটা বেদানুগামী বা বেদবিরুদ্ধ তা নিয়ে তর্ক রয়েছে। মাহভারতীয় তন্ত্র অবশ্য বেদানুসারী, তাই বামাচার সেখানে অনুপস্থিত।

'ধৃষ্' ধাতু থেকে 'ধর্ষণ' শব্দটি এসেছে। ধৃষ্ হলো হিংসা। ধর্ষণের ইতিহাস প্রাচীন। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র নাকি জগতে প্রথম ধর্ষণপ্রথা চালু করেন, তাই সমস্ত ধর্ষণের অর্ধেক পাপ তাঁকেই বহন করতে হয়। 'বলপূর্বক বিবাহ' যেমন প্রাচ্যে আকছার ঘটেছে এবং ঘটে, তেমনই পাশ্চাত্যে 'বীরত্বপূর্ণ ধর্ষণ'-এর কথা আছে। মহাভারতে 'দারামর্ষ' শব্দের দ্বারা 'স্ত্রীধর্ষণ' বোঝানো হয়েছে। মহাকাব্যের বনপর্বে যবক্রীত ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত। দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি তাঁর অগ্রজপত্নী মমতাকে বলাৎকার করেন। কীচক ও জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ধর্ষণ নিয়ে আলোচনা আছে।

চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিপরীত লিঙ্গের বস্ত্রকাম। এটিকে মানসিক রোগের পর্যায়ে ফেলা হয়। অন্য লিঙ্গের পোশাক পরে যাঁরা যৌনানন্দ লাভ করেন তাঁদেরই এই আধি হয়ে থাকে। শিখণ্ডী প্রথম জীবনে নারী হয়েও পুরুষদের পোশাক পরে ঘুরতেন এবং তাঁর সামাজিক লিঙ্গ ছিল পুরুষ। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব গর্ভবতী নারীর মতো সাজপোশাক পরে ঘুরেছিলেন। অর্জুনও অভিশাপগ্রস্ত হওয়ার পর হাতে বালা, মাথায় বেণী ও নারীদের মতো পোশাক পরে ঘুরেছেন। বিপরীত লিঙ্গের বস্ত্রকাম তথা বস্তুকামের বহু সন্ধান মেলে ভারতীয় ঐতিহ্য ও পুরাণে। প্রাণিজগতে বরাহরা বস্তুকামী। সংক্ষিপ্ত পরিসরে মহাকাব্যের আলোকে এই পর্বটি রচিত হয়েছে।

যৌনমিলনে বর্ণসংকরত্ব মহাভারতের চোখে অপরাধ। যদিও মনু অনুলোম বিবাহকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, কিন্তু মহাভারত অনুলোম ও প্রতিলোম দুই বিবাহকেই নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছে। তবু দেখা যায়, ব্রাহ্মণ পরাশর ও ক্ষত্রিয়া সত্যবতীর গর্ভে বর্ণসংকর ব্যাসদেব জন্মেছেন, যিনি মহাভারতের রচয়িতা। ব্যাসদেবকে তবু

'ব্রাহ্মণ' বলা হয়, যদিও তাঁর 'মূর্ধাভিত্তিক' হওয়ার কথা। সেই ব্যাসদেব ক্ষত্রিয়া নারীদের গর্ভে সংকর ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম দিলেন। শূদ্রা দাসীর গর্ভে উৎপন্ন করলেন বিদুরকে। প্রতিলোম বিবাহের দৃষ্টান্ত হলো, ব্রাহ্মণী দেবযানীর সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজা যযতির বিবাহ। পঞ্চদশ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহ।

ষোড়শ অধ্যায়টি মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে বিধৃত 'কামগীতা' নিয়ে। মোট ষোলোটি গীতার সন্ধান পাওয়া যায় এই মহাকাব্যে। কামগীতায় বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতা যুধিষ্ঠির। সেখানে কাম বলছেন, অনুপযুক্ত উপায়ে কেউ আমাকে বিনষ্ট করতে পারে না। কামগীতার দার্শনিক তত্ত্ব দ্বৈতবাদের দিকে ঠেলে দেয়। কেউ কেউ বলেন, এ আসলে অদ্বৈতগর্ভ দ্বৈতবাদ। কিন্তু সমগ্র মহাভারতে দ্বৈতবাদেরই প্রাধান্য দেখা যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়ে মহাভারতে 'মিলনে উপেক্ষিতা নারী' নিয়ে আলোচনা আছে। সত্যবতী, অম্বিকা, অম্বালিকা, দেবযানী, শকুন্তলা, অম্বা, মাদ্রী, হিড়িম্বা, ভীমের আরও দুই স্ত্রী বলন্ধরা ও কালী, যুধিষ্ঠিরপত্নী দেবিকা, নকুলপত্নী করেণুমতী, সহদেবজায়া বিজয়া ও জরাসন্ধসূতা, অভিমন্যুপত্নী উত্তরা, যাদব-কৌরব-পাণ্ডব পক্ষের অকাল বিধবারা অত্যন্ত কষ্টে দিন কাটিয়েছেন। তাঁদের নিয়েই এই পর্ব।

আঠারো পর্বটি নারী-সমকামী, পুরুষ-সমকামী, উভকামী ও রূপান্তর-কামীদের নিয়ে। সংক্ষেপে এদের 'এলজিবিটি' বলা হয়। বৈদিক সাহিত্যের মিত্র ও বরুণ, সূর্যবংশীয় রাজা দিলীপের দুই বিধবা স্ত্রীর সম্পর্ক সমকামিতার পর্যায়ভুক্ত। আবার এঁরা অসমকামী আচরণেও অভ্যস্ত ছিলেন। রাজা ভঙ্গাস্বন, শিখণ্ডী রূপান্তরকামী ছিলেন। শিখণ্ডী স্ত্রী হয়েও পুরুষ হতে চাইতেন এবং লিঙ্গ পরিবর্তন করে তা হন। ভঙ্গাস্বন অভিশাপের ফলে স্ত্রী হন, কিন্তু তাঁকে পুরুষত্ব ফেরত দেওয়া প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তিনি মনে করেন, স্ত্রীরূপেই তিনি বেশি সুখে আছেন।

মহাভারত হলো পঞ্চম বেদ বা সংহিতা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো যুধিষ্ঠিরকে ব্যক্তিত্বহীন বা ভীমকে 'রক্তপ রাক্ষস' জাতীয় মন্তব্য করা থেকে এই সন্দর্ভ দূরে রয়েছে, তেমনই দুর্যোধন 'পূর্ণ পাপী' না 'প্রজারঞ্জক রাজা', সে বিষয়েও ব্যাখ্যা বিধৃত করেছে মাত্র। ঘটোৎকচ-বধের পর কৃষ্ণের নৃত্য বা পঞ্চ-উপপাণ্ডবের মৃত্যুর পর পাণ্ডবপক্ষের উল্লাসের কথা বিবৃত করাই উচিত, যেমন ব্যাসদেব বলেছেন।

পণ্ডিতরা মনে করেন, কলি ও দ্বাপরের সন্ধিকালে মহাভারতের মহাযুদ্ধ হয়। কলি চতুর্থ এবং দ্বাপর হলো তৃতীয় যুগ। দ্বাপরের পূর্বে আছে সত্য ও ত্রেতা। পাশার যে দিকে দুইটি বিন্দু তাকে 'দ্বাপর' বলে। আর 'কলি'-র অর্থ সমর বা যুদ্ধ। মহাভারতে বহু আপাতবিরোধী বাক্য আছে, অনেকে সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলে উড়িয়ে দিতে চান। এটা এক ধরনের দুঃসাহস বা ধৃষ্টতা। বিরোধের এমন সহজ-

সমাধান হাস্যকর। তাছাড়া রুচিবিরুদ্ধ অংশকে মহাভারতের অঙ্গ নয় বললে শ্রমলাঘব হয়। আর কে না জানে, কঠোর বিকল্পের কোনো পরিশ্রম নেই। মহাভারতের আর একটি বিষয় বলে রাখা খুব জরুরি। ব্যাসদেব তাঁর প্রতিটি চরিত্রকে মানুষ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, দেবত্বে উত্তীর্ণ করেননি; যার ফলে তিনি নিজেকে 'কানীন-পুত্র' জেনেও কানীন-সন্তানকে 'পাপ' আখ্যা দিতে ছাড়েননি। মহাভারত এক বহুমুখী আশ্চর্য সন্দর্ভ। তার একটি অংশ 'অযোগ্য' ও 'অপটু' লেখকের ওপর বিশ্লেষণের ভার দিয়েছিলেন অগ্রজ সাহিত্যিক অধীর বিশ্বাস। শ্রদ্ধেয় দিব্যজ্যোতি মজুমদার পুরো পাণ্ডুলিপি নিষ্ঠাসহকারে পড়েছেন। তাঁদের দু'জনের কাছে ঋণ নয়, শ্রদ্ধায় অবনত হই। আর রূপাকে কীভাবে ধন্যবাদ জানাবো, তা মহাভারতে লেখা নেই। কৃতজ্ঞতা জানাই আর সেই বন্ধুদের, যাঁরা কোনো না কোনোভাবে এই গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত।

অক্ষয় তৃতীয়া, ১৪২০ — শামিম আহমেদ